জয়দেব-কেঁদুলির আখ্যান ও মেলা

অতসী সরকার

"মহান সাধক কবি জয়দেব প্রণামি তোমার পায়"
কেঁদুলি মেলার বিষয়ে জানাব এখন এ লেখাটায়।

জেলা বীরভূম অজয়ের তীরে কেন্দ্র বিল্লগ্রাম ছিল বামাদেবী আর ভোজদেব গোস্বামীর-ই ধাম। পরম বৈষ্ণব বসন-ভুষণে হরিভক্ত সে পরিবার সেই পরিবারে জন্ম নিলেন কবি জয়দেব মহাভার।

জনশ্রুতি এই যে ১১৭০ খ্রিস্টাব্দে বৈষ্ণব সাধক ভক্ত কবি জয়দেব গোস্বামী শ্রীপঞ্চমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ছোটবেলা থেকেই মেধাবী জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী হয়ে ওঠার সাথে সাথে তার সংগীত প্রতিভার খ্যাতিও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে। শোনা যায় যে জয়দেব ও তার স্ত্রী পদ্মাবতী মার্গীয় সংগীতে পারদর্শী ছিলেন। তৎকালীন বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেন তাঁকে সাদরে সভাকবি হিসেবে বরণ করে তাঁর পঞ্চরত্ন এর মধ্যে অন্যতম রত্ন হিসেবে স্বীকৃতি দেন। শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা হিসেবে কবি জয়দেব 'কবিরাজ' উপাধি লাভ করেছিলেন এবং সঙ্গে পেয়েছিলেন রাজার পারিতোষিক।

রাজা লক্ষ্মণ সেন এর রাজত্বকালে সমাজ জীবনে পারস্পরিক জাতিগত ঘৃণা বিদ্বেষ অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। শুধুমাত্র সমাজের সকল স্তরের উপভোগ্য বিষয় ছিল পুরাণ প্রসিদ্ধ রাধা-কৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক বিভিন্ন কাব্যের আদি রসাত্মক বর্ণনা ও তার মাহাত্ম্য। রাধাকৃষ্ণের লৌকিক ও অলৌকিক প্রেমলীলা বিষয়টি সমাজের সকলেই উপভোগ করতে পারতেন। সমাজ জীবনের এই বিষয় ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই কবি জয়দেব রচনা করেছিলেন, 'শ্রীশ্রী গীতগোবিন্দম্'। রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে মুখ্য উপজীব্য করে এটি একটি সংস্কৃত গীতিকাব্য। সাধক ভক্ত কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দম্ এর মূল প্রেক্ষাপট যমুনা নদী সংলগ্ন বৃন্দাবন। সাধক ভক্ত কবি জয়দেব গোস্বামী প্রথম জীবন অতিবাহিত করেন ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বীরভূম জেলার নানুর ব্লকের কেন্দুবিল্ব গ্রামে। তারপর তিনি গৌড় অঞ্চলে বেশ কিছুদিন বসবাস করেন এবং শেষ জীবন অতিবাহিত করেন উড়িষ্যায় এবং বৃন্দাবনে।

এইবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বীরভূম জেলার নানুর নামক ব্লক এর অন্তর্ভুক্ত

কেন্দুবিল্ব (লোকমুখে কেন্দুবিল্ব শব্দটি কেঁন্দুলী থেকে কেঁদুলি তে পর্যবসিত হয়েছে) নামক গ্রামে অনুষ্ঠিত কেঁদুলি মেলা প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক।

এই মেলা মকরসংক্রান্তির দুদিন আগে থেকে শুরু হয়ে যায় এবং সূর্যের উত্তরায়ণ সূচিত হলে, মকরসংক্রান্তির পুণ্য-স্নানের দিন শেষ হয়। এটাই মূল মেলা।

পুণ্যস্নানের পরে শুচি বস্ত্র পরিধান করে ভক্তেরা হাজির হন কবি জয়দেব পূজিত রাধাবিনোদ মন্দিরে এবং সেখানে নিজেদের পূজার অর্ঘ্য প্রদান করেন রাধাবিনোদ ও সাধক-ভক্ত-কবি জয়দেব কে। কিন্তু তিন দিনের পরেও ভাঙ্গা মেলা হিসাবে আরও ১০-১২ দিন মেলা গড়িয়ে চলে। এই মেলার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য নিম্বার্ক আশ্রম প্রবর্তিত মেলা শুরুর দিন থেকে আগত পুণ্যার্থীদের জন্য যে অন্ন-সত্রের ব্যবস্থা করা হয়ে আসছে, তার দেখাদেখি মেলার প্রায় সমস্ত স্থায়ী-অস্থায়ী আখড়ায় ও মণ্ডপে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিসেষে মেলায় আগত পুণ্যার্থীদেরকে মূল মেলার তিনদিন ধরে দুইবেলা করে বিনামূল্যে অন্নদানের আয়োজন করা হয়। অর্থাৎ জয়দেব কেঁন্দুলি মেলায় খাবার অভাবে কাউকে কষ্ট পেতে হয় না।

এই মকর সংক্রান্তির স্নানের দিনকে নিয়ে একটি কিংবদন্তি কথিত আছে। এই দিনে নাকি জয়দেব পায়ে হেঁটে কেঁন্দুবিল্বগ্রাম থেকে বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার ভাগীরথী-অজয়ের সঙ্গমস্থলে স্নান করতে যেতেন। বয়োজনিত কারণে এবং অসুস্থ শরীর থাকায় একবার তার অজয় নদের সঙ্গমে মকরসংক্রান্তির পুণ্য-স্নান করতে যাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। বিনিদ্র সারারাত তিনি গঙ্গাদেবীর স্তোত্র পাঠ করতে থাকেন এবং মকরস্নান করতে যাওয়ার মতো শারীরিক সক্ষমতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন। গো-মুখ থেকে যেরকম ভাবে গঙ্গা উৎসারিত হয়ে এসেছেন তেমনি জয়দেবের দু'চোখ বেয়ে বেদনাশ্রু প্রবাহিত হতে থাকছিল। মকরসংক্রান্তির দিন সকালে কেঁন্দুবিল্বগ্রামের আপামর জনসাধারণ তাকিয়ে দেখল যে দক্ষিণ বাহিনী ভাগীরথী গঙ্গা ধারা স্বয়ং পূর্ব-দক্ষিণ বাহিত হয়ে অজয় নদীতে জোয়ারের ধারায় প্রবেশ করেছে। এই বিষয়টাকে গঙ্গার 'উজানে বওয়া' বলে বোঝানো হয়ে থাকে। এই দৃশ্য দেখে আনন্দাশ্রু দর বিগলিত হয়ে কবি জয়দেব গঙ্গাদেবীর স্তব করতে করতে মকর সংক্রান্তিতে কদম্বখুন্ডী ঘাটে অজয় নদীতে আগত ভাগীরথী গঙ্গার পূত সলিলে পুণ্যস্নান সমাপন করলেন।

সেই থেকে কবি জয়দেব গোস্বামীর স্মৃতিবিজড়িত মকরসংক্রান্তির

পুণ্য-স্নান এবং সেই উপলক্ষে বিপুল জনসামগমকে কেন্দ্র করে মেলার আয়োজন প্রায় আটশো বছর পার হয়ে এসে এখনও মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কুম্ভ মেলার স্নান, গঙ্গাসাগর মেলার স্নান এবং মকর সংক্রান্তিতে অজয় নদীতে স্নান এর পুণ্য সঞ্চয় প্রায় সমান বলে পরিগণিত হয়।

লক্ষ লক্ষ ভক্ত সমাগম হলেও কুম্ভ মেলায় প্রথম স্নানের অধিকার যেমন নাগা সন্ন্যাসীদের। আর গঙ্গাসাগর মেলায় প্রথমে স্নান করার অধিকার পেয়ে থাকেন উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত সেবায়েত ও মহান্তরা। প্রথম থেকেই জয়দেব কেঁন্দুলি মেলায়, মকর সংক্রান্তির ঊষালগ্নে, আগত ভক্ত-জনেরা যার যেমন খুশি তেমন ভাবে স্নান করতে পারতেন। কিন্তু নিম্বার্ক পন্থী বৈষ্ণবরা কেঁন্দুলি মেলার ভার নেওয়ার পর থেকে তাদের মহান্তরাই সবার আগে স্নান করার অধিকার পেয়ে আসছেন। পঞ্চান্ন থেকে ষাট বছর আগেও কেঁন্দুলীর নিম্বার্ক পন্থী সাধুমহান্তরা তাদের আশ্রম থেকে অজয় নদীর ঘাট পর্যন্ত হাতির পিঠে চেপে মহাসমারোহে স্নানের জন্য যাত্রা করতেন। সেই মকরসংক্রান্তির স্নানকে কেন্দ্র করে একদিনের জন্য আগত লোকজনের ভীড় বেড়ে যাওয়ার কারণে নিম্বার্ক আশ্রমের মহান্তরা অজয় নদীর চর থেকে মেলাকে তুলে নিয়ে আসনে ডাঙ্গা এলাকায়।

ক্রমশ বছরের পর বছর ধরে মেলায় পুণ্যার্থীর সংখ্যা অসম্ভব বেড়ে যাওয়ার কারণে নিম্বার্ক আশ্রম থেকে যথাযথভাবে লোক নিয়োগ করে মেলা প্রাঙ্গণের ময়লা পরিষ্কার, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং মেলা প্রাঙ্গণে যারা পসরা নিয়ে বসতো তাদের কাছ থেকে যথাযথ খাজনা আদায় প্রথা আরম্ভ হয়। এবং সেই আদায়কৃত অর্থ আগত পুণ্যার্থীদের অন্নদান, সেবা ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হতো।

১৯৮১ সাল থেকে মেলা পরিচালনার ভার আর নিম্বার্ক আশ্রমের মহান্তদের হাতে নাই। মেলা পরিচালনার ক্ষমতা এখন সরকার এবং সরকার পরিচালিত মেলা কমিটির হাতে। আগে যেমন মেলায় আগত পুণ্যার্থীদের জন্য কোনরকম শৌচাগারের ব্যবস্থা ছিল না। মেলা সংলগ্ন অজয় নদের চরকেই আগত লাখো নর-নারী শৌচাগার হিসেবে ব্যবহার করতো। ফলে পরিবেশ ভয়ংকরভাবে দূষিত হতো। বর্তমানে অজয়ের চরে সরকারিভাবে বিপুল সংখ্যক শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হয়। সরকারিভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয় মেলা প্রাঙ্গণে যা আগে কোনও দিনই ছিল না। এছাড়া আগেকার দিনের মেলায় স্বাস্থ্যকর পানীয় জলের ভয়ানক অভাব ছিল। সরকারি ভাবে তা দূর করে দেওয়া হয়েছে। মেলায়

পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকছে ইদানীং। সবচেয়ে বড় কথা বর্তমানে সরকারি হস্তক্ষেপে ও সুন্দর পরিচালনার মাধ্যমে এবং পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় আগত লাখো লোক ভালোভাবে মেলা উপভোগ করতে পারছেন। আগে সবাইকে যেমন পায়ে হেঁটে অথবা গোরুর গাড়িতে কেঁন্দুলি মেলা আসতে হতো অনেক কষ্ট করে। বর্তমানে বিভিন্ন রকমের গাড়ি ঘোড়ার ব্যবহার করে মানুষ যে যার সুবিধা মতো মেলায় আসছেন এবং যাচ্ছেন। তবে স্থায়ী কোন বাসস্ট্যাণ্ড কেঁন্দুলি মেলার জন্য গড়ে ওঠেনি।

টপআপে আশেপাশের ৬৪ গ্রামের মানুষ মেলায় ভীড় করত। এখন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বহু ভ্রমণকারী, দর্শনার্থী ও পুণ্যার্থী কেঁন্দুলি মেলায় অংশগ্রহণ করছেন। পুরাকালের মেলায় গ্রামীন মানুষের নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র বিক্রি হতো। সাথে থাকতো কৃষিকাজের উপযোগী যন্ত্রপাতি, যথা - কাস্তে, নিড়ানি, লাঙলের ফলা, লাঙ্গল, গোরুর গাড়ির চাকা ইত্যাদি। বর্তমানে এর সাথে ইলেকট্রনিক দ্রব্যাদিও মেলায় বিক্রি হচ্ছে। আজকাল মেলা বিকাশ আকার ধারণ করেছে। অজয় নদীর ধার বরাবর চর থেকে ডাঙ্গায় কৃষি জমির উপরেও কয়েক বর্গমাইল এলাকা জুড়ে মেলা বসছে। হালফিল মেলায় পুতুল নাচ, ম্যাজিক, কূপের মধ্যে মোটরসাইকেল চালানো, যান্ত্রিক-বিশাল মেরীগো রাউনজ, টয়ট্রেন, যান্ত্রিক নাগরদোলা, মরণ-কূপে ঝাঁপ, সার্কাস এসব রমরমিয়ে চলছে।

প্রথমদিকের মেলা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত চলত। পরের দিকে হ্যাজাক কার্বাইডের বাতি ইত্যাদি আবিষ্কার হওয়ার ফলে রাতের দিকেও কিছুক্ষণ মেলা চলত। এরও পরের দিকে মেলায় জেনারেটরের মাধমে বিদ্যুতের ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে সরকারি ব্যবস্থাপনায় মেলায় বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রায় সারারাত ধরেই কেনাবেচা চলতে থাকে। আলোর রোশনাই এ ভরে থাকে চারপাশ।

একেবারে প্রথম দিককার মেলার দিনগুলোতে চলতো পুণ্যস্নান, পূজা পাঠ, কবি গান, যাত্রা, ধর্মকথা আলোচনা এবং সর্বোপরি হরিনাম সংকীর্তন। তবে এখন গান বাজনার সাথে তবলা, ঢোল, খোল, ডুবকি, ঢোল, সানাই, করতাল, খঞ্জনী, খমক এইসব প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রের সাথে আধুনিক স্প্যানিশ গীটার ব্যাস, ব্যাস গীটার, সিন্থেসাইজার, অক্টোপ্যাড এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক বাদযন্ত্রে ও যন্ত্রানুষঙ্গের ব্যবহার ঘটেছে। এখনকার মেলায় পুরানো দিনের সবকিছুর সাথে বেলুন-বাঁশি, মাটির পুতুল-বারবি ডল, মিকি মাউস-স্পাইডারম্যান, আইসক্রিম-চকলেট,

এগরোল-চাওমিন, মোগলাই-বিরিয়ানি থেকে শুরু করে এয়ারগান দিয়ে বেলুন ফাটানো, কি নানান রকমের লটারি ও নানান রকমের ভাগ্য পরীক্ষার খেলার চল হয়েছে। মেয়েদের চুড়ি, শাড়ি ও সালোয়ার কামিজ, জিন্সের প্যান্ট, টপ, কুর্তি, লেগিন্স এমনকি লিপস্টিক-নেলপালিশ, চশমা-গগলস ও পাওয়া যাচ্ছে এখনকার কেঁন্দুলি মেলায়। চীনেমাটি, মেলামাইন, অ্যালুমিনিয়াম, তামা, কাঁসা, পিতল, প্লাস্টিক এসব দিয়ে তৈরি হাজারো সম্ভারে মেলা মৌনমুখর হয়ে ওঠে ইদানীং।

মাইক আবিষ্কার এর আগে পর্যন্ত মেলার সমস্ত ধর্মীয় কার্যাবলী পরিচালনা হতো কেবলমাত্র কণ্ঠস্বরকে নির্ভর করে। পরে মাইকের ব্যবহার শুরু হয়। ক্রমশ মাইকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার অত্যাচারের পর্যায়ে উপনীত হয়। কয়েক বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে শতাধিক অস্থায়ী মণ্ডপে এবং কেঁন্দুলি গ্রামে কবি জয়দেবকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নানান সম্প্রদায়ের স্থায়ী মঠ ও মিশন থেকে কয়েক হাজারেরও বেশি মাইকে ২৪ ঘন্টা ধরে নিরন্তর তারস্বরে বাজতে থাকা, বাউল-ফকিরি-জারি-সারি-মারফতি-ভবা পাগলার গান-পদাবলী কীর্তন-গীতগোবিন্দম্ পাঠ ও হরিনাম সংকীর্তন। এর সাথে যোগ হয় লাখো মানুষের হাজারো কথার আওয়াজ। তার ফলে মনে হতো যেন তপ্ত-শব্দ-কটাহে নিক্ষেপ করে পুণ্যার্থীদের কান-মাথা ভাজা ভাজা করা হচ্ছে। তবে সুখের কথা বর্তমানে হাইকোর্টের শব্দ নিয়ন্ত্রণ আইনের আদেশ বলে এবং পুলিশি তৎপরতায় সেই ভয়ঙ্কর শব্দ দানব অনেকটাই হীন বল।

উল্লেখ থাকে যে, সম্রাট ঔরঙ্গজেব এর আমল থেকে কেঁন্দুবিল্বগ্রাম সেন পাহাড়ি পরগনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে সেটি বর্ধমান মহারাজা কৃষ্ণরাম রায়ের অধিকারভুক্ত হয়। বর্ধমান মহারাজার মহারাণী ব্রজকিশোর দেবী আট ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে জয়দেব পূজিত রাধাবিনোদ বিগ্রহের জন্য, রাধাবিনোদ মন্দির স্থাপন করেন।

১৯১১ সালে বাংলা ও বিহার ভেঙে দুটি পৃথক প্রদশে গঠিত হলে বীরভূম বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলা অবিভক্ত বাংলা রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। তখন থেকে কেঁন্দুবিল্ব মেলা পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার মেলা হিসেবে পরিগণিত হয়। হাড় কাঁপানো প্রচণ্ড শীতকে উপেক্ষা করে জানুয়ারির মাঝামাঝি মকরসংক্রান্তির পুণ্যস্থানকে মাথায় রেখে যে সমস্ত মানুষজন কেঁন্দুলি মেলায় উপস্থিত হয় তাদের বিচিত্র শীতপোশাকের বহর দেখলে অবাক হতে হয়। কারও গায়ে কাঁথা, কারও গায়ে মলিদা, কেউ গায়ে চড়িয়েছে শাল। বিচিত্র বর্ণের সমাহার। নানান রকমের সোয়েটার জ্যাকেট এর যেন ফ্যাশন শো শুরু হয়েছে। পাজামা লুঙ্গি ধুতি জামা কোট আর নানা

ধরনের প্যান্ট। রং আর রকমের শেষ নেই। কারও মাথায় পাগড়ি কারো মাথায় টুপি, মাঙ্কি টুপি, কেউ কান ঢেকেছে মাফলারে, কারো কানে মাথায় কষে গামছা বাঁধা।

আখড়ায় আখড়ায় জ্বলে ধুনী, মেলার নানান জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে শীত ভাগাতে জ্বলে আগুন, চলে হাত পা সেঁকা। আর স্থানীয় লোকেরা, যারা মেলা দেখতে সপরিবারে কাঁথা কম্বল নিয়ে এসেছিল তারা ঘুম পেলে যেকোনো মণ্ডপে ঘুমিয়ে পড়ছে। এ যেন ভগবানের নামের সাথে ঘুমিয়ে পড়ে নামের সাথে জাগে। স্থায়ী পাকা মঠ বা আখড়াগুলো সাধ্যমত সেজে ওঠে এই সময়। তিল ধারণের জায়গা থাকে না কোথাও। অজয় নদীর চরে আর ফাঁকা ফসলের খেতে পশ্চিমবঙ্গের এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত নানান ধর্মীয় সংগঠনের বিশাল বিশাল অস্থায়ী মণ্ডপ তৈরি হয়। প্রতিটা মণ্ডপে প্রচুর পরিমাণে থাকে মাইক আর সাউণ্ড বক্স। কোথাও বাউল গান, কোথাও ভবা পাগলার গান, ফকিরি গান, কবিগান, পদাবলী কীর্তন, গীতগোবিন্দম্ পাঠ, আর হরিনাম সংকীর্তন। এখন সরকারিভাবেও একটি বিশাল দৃষ্টিনন্দন অস্থায়ী যে সাংস্কৃতিক মণ্ডপ তৈরি করা হয়। এবং সেখানে লোকসংস্কৃতির সেরা গাইয়ে বাজিয়ে শিল্পীরা অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। এছাড়া মেলায় বহু রকমের সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের ছোট-বড় আস্তানায় শোভা পেতে থাকে বিচিত্র সাজসজ্জায় সমন্বিত ভক্ত ও ভক্তির ভাব। সেসব আখড়ায় মোটা মোটা গাছের ডালে জ্বলে ধুনী। মেলার কদিন অনির্বাণ ভাবে সে আগুন জ্বলতেই থাকে। নাগা সন্ন্যাসী, যোগী, তান্ত্রিক, বিশাল জটাজুট সমন্বিত সাধু সন্ন্যাসী, জ্যোতিষী, বিশাল মেলার আনাচে-কানাচে স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে ওঠেন।

মেলায় পঞ্চ সম্প্রদায়ের হিন্দু অর্থাৎ - (১) সূর্যের উপাসক সৌর, (২) যারা শিবের উপাসক শৈব, (৩) যারা মা কালীর উপাসক শাক্ত, (৪) গণেশের উপাসক গাণপত্য এবং (৫) বিষ্ণুর উপাসক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরা বিপুল সংখ্যায় উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে কেঁন্দুলি মেলায় যোগদান করে থাকেন।

এছাড়া দশনামী সম্প্রদায়, যেমন— (১) তীর্থ, (২) আশ্রম, (৩) বন, (৪) অরণ্য, (৫) গিরি, (৬) পর্বত, (৭) সাগর, (৮) সরস্বতী, (৯) ভারতী এবং (১০) পুরী, উপাধিধারী সন্ন্যাসীরাও এই মেলায় অংশগ্রহণ করে মেলার গৌরব বৃদ্ধি করেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব, গৌড়ীয় সহজিয়া, আউল-বাউল ফকির দরবেশ সম্প্রদায়ের ভক্তেরা ছাড়াও শ্রী চৈতন্যদেবের পার্যদ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর ভক্তেরা ছাড়াও শ্রী চৈতন্যদেবের পার্ষদ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পুত্র বীরভদ্র কর্তৃক প্রবর্তিত ‘নেড়া-নেড়ী’

সম্প্রদায়ের উপস্থিতি কেঁন্দুলি মেলার একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কেঁন্দুলি মেলায় 'ন্যাড়া-নেড়ী' তলা বলে নির্দিষ্ট জায়গায় এরা সমবেত হয়ে থাকেন। এদের বেশভূষা বাউল ফকিরদের মতো নানা বর্ণের কাপড়ের টুকরো দিয়ে তৈরি হয়। কেউ কেউ গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করে থাকেন। কিন্তু এরা হরিবোল এবং জয় বীরভদ্র ধ্বনি দিয়ে থাকেন।

এছাড়াও কর্তাভজা, কিশোরী ভজন, বলাহাড়ি, মতুয়া, সাহেবধনি ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়ের ভক্তবৃন্দের আন্তরিত যোগদানের ফলে কেঁন্দুলি মেলার সর্বজনীন রূপ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। এর সাথে মেলায় এসে উপস্থিত হয় অসংখ্য ভিখারী, অন্ধ, কুষ্ঠ রোগী, পোলিও রোগী, সাধু-সন্ন্যাসী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এরাও ক্রমশ মেলাতে অঙ্গীভূত হয়ে উঠেছে।

আর একটা কথা না বললে কেঁন্দুলি মেলার বর্ণনা সম্পূর্ণ হয় না, সেটা হচ্ছে কলা। মানে কলার কথা না বললে কেঁন্দুলি মেলার ষোলোকলা পূর্ণ হবে না। যুগ-যুগান্ত ধরে চাঁপা কলাও কেঁন্দুলি মেলার একটি বৈশিষ্ট্য এবং অঙ্গ হয়ে উঠেছে। মেলায় কয়েক লক্ষ কলা কেনাবেচা হয়। আর দূর দূরান্ত থেকে মেলায় আগম মানুষজনেরা জল খাবার হিসাবে মুড়ির সাথে চাঁপা কলাকে আহার্য হিসেবে গ্রহণ করে। এছাড়াও মহানন্দে পুঁটুলি বেঁধে বাড়িতে নিয়ে যায়।

কেঁন্দুলি মেলা যেহেতু একজন কবিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে তাই যুগ যুগান্তর ধরে এই মেলা কবিদেরও আকর্ষণ করে এসেছে। আধুনিক কবিরাও ছুটে যান জয়দেব-কেঁন্দুলি মেলার অমোঘ আকর্ষণে। কবি সম্মেলনও এখন এই মেলার একটি অঙ্গ। মেলায় স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর বসে। বহু পত্র-পত্রিকাও এই উপলক্ষে প্রকাশিত হয়। আধুনিক কবিদের মধ্যে কেঁন্দুলি মেলা নিয়ে প্রচণ্ড আবেগ উন্মাদনা লক্ষ্য করা গেছে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় এর মধ্যে। তিনি প্রায় ছয় কেঁন্দুলি মেলায় যোগ দিতেন। আর তাকে ঘিরে কবি আর গুণমুদ্ধ পাঠকের হাট বসে যেত। কেঁন্দুলি মেলার ব্যাপারে শক্তি চট্টোপাধ্যায় এতটাই আবেগতাড়িত ছিলেন যে, "সাহিত্যের আখড়া" বানাবেন বলে সেখানে তিনি জায়গাও কিনেছিলেন।

প্রচণ্ড কনকনে ঠাণ্ডায়, কেঁন্দুলিতে মকরসংক্রান্তির দিন, ঊষা লগ্নের মাহেন্দ্রক্ষণে, পুণ্যস্নানের সময় অজয় নদ সংলগ্ন এলাকা ঘন কুয়াশায় অবগুণ্ঠনে ঢাকা পড়ে যায়। আর বুকভর্তি বালি নিয়ে প্রায় জলহীন অজয় নদ পুণ্য লোভাতুর নর-নারীদের জন্য সকৌতুকে অপেক্ষা করতে থাকে।

বর্তমানে সরকারি ভাবে অজয় নদের বুকে বালির বাঁধ দিয়ে ছোট ছোট জলাধার তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। এর জন্য পণ্যস্নানের আর কোনো অসুবিধা হয় না।

সেই জয়দেবের আমল থেকে বিভিন্ন বৈষ্ণব গোষ্ঠী কেঁন্দুলি গ্রামকে কেন্দ্র করে বসবাস আর ধর্মচর্চা শুরু করেছিলেন। ক্রমে ক্রমে ওইসব গোষ্ঠীর স্থায়ী আখড়া গড়ে ওঠে। এছাড়াও ভারতবর্ষের বিভিন্ন মঠ ও মিশনের স্থায়ী আশ্রম ও কার্যালয় সেখানে আছে। সেইসব আখড়ায় নানান সাধু সন্ন্যাসী ও ভক্তবৃন্দের আগমনে মেলার জৌলুস বহুগুণ বেড়ে যায়। সারারাত ধরে মেলার রাস্তাগুলি দর্শনার্থীদের হাঁটাচলায় গম গম করতে থাকে। আর লক্ষ-পদ-তাড়নায় পথের ধুলো-বালি মাথা ছাড়িয়ে আকাশের দিকে ওঠে আর আবিরের মতো মানুষজন দোকানপাট গাছপালাকে ধূলা-রঞ্জিত করে তোলে। হালফিল কম্পিউটার ল্যাপটপ আর মোবাইল ফোনের সাথে ইন্টারনেট সংযোগ থাকায় কেঁন্দুলি মেলায় আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। আগে যেমন মেলায় কয়েকশো জন ক্যামেরা নিয়ে আসতো ছবি তুলবার জন্য। বর্তমানে ছবি তোলাবার জন্য মোবাইল এর ফ্ল্যাস এর ঝলক বেড়েই চলেছে। আর সেলফি'র জন্য ব্যাকুল ব্যাগ্র মুখগুলি ঘিরে, মোবাইল স্ক্রিনের আলোদের, মধুর-পেলব-কান্তি বিস্তার, মেলার লাখো লোকের ভিড়ে আকাশে, তারকার দ্যুতি ছড়িয়ে যাচ্ছে। আটশো (৮০০) বছরের এই প্রাচীন মেলাকে ঘুরে দেখতে আর পুণ্য সঞ্চয় করতে, মকরসংক্রান্তির দুদিন আগে বা মকরসংক্রান্তির দিন চলে আসুন পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার নানুর ব্লক এর কেঁন্দুবিল্ব গ্রামে।

জয়দেব-কেঁন্দুলি মেলায় আসুন নিয়ে খোলা প্রাণ-মন
ভক্তিভাবের দোলায় দুলন ক'রে রাধা-কৃষ্ণ প্রেম আস্বাদন —
প্রাচীন মহান কবির চরণে প্রণাম জানাই আমি
আমার লেখাও শেষ এইবার, এইখানে গেল থামি।
আমি "ডক্টর" অতসী সরকার লেখা করি সমাপন
গীতগোবিন্দম্, কেঁন্দুলি-মেলা বেঁচে থাক অনুখন।

তথ্যসূত্র ঃ

জনশ্রুতি, লোক-কাহিনী এবং গ্রামীণ ক্ষেত্র সমীক্ষা ভিত্তিক তথ্যের উপর নির্ভর করে উপরের নিবন্ধটি লেখা হয়েছে।